কারাবাসের দিনগুলি

কারাবাসের দিনগুলি

জায়নাব আল গাজালি

ইমরান হোসাইন নাঈম
অনূদিত

নাশাত

কারাবাসের দিনগুলি
মূল : জায়নাব আল গাজালি
অনুবাদ : ইমরান হোসাইন নাঈম

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মদ
বানানসংশোধন : আবদুল্লাহ মুহাম্মদ

মূল্য : ২৭০ (দুইশ সত্তর) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

বাবা ও মাকে

অনুবাদকের কথা

কিছু কিছু বই কেবল ইতিহাস সংরক্ষণ করে। সে বইগুলো পড়লে আমরা ইতিহাসটা জানতে পারি, বুঝতে পারি।

কিন্তু কিছু বই স্বয়ং ইতিহাস তৈরি করে, তাতে থাকে ইতিহাসকে খুব কাছ থেকে দেখবার, ঘটনাপ্রবাহ অনুভব করবার; একটা অনুভূতি। এ ধরনের বইগুলোর মধ্যে আত্মজীবনীর স্থান অনন্য পর্যায়ে। ইতিহাসের ভেতর থেকে বেড়ে-ওঠা-ব্যক্তির হাত ধরে সময়ের কানাগলিতে ঘুরে বেড়ানো, হাসি-কান্না ও দুঃখ-বেদনা অনুভব করা; এর নামই হলো আত্মজীবনী, যা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

আর সেই আত্মজীবনী যদি হয় ইসলামের জন্য সংগ্রামরত ব্যক্তির, যিনি ইসলামের জন্য জেলের ভেতরে সয়েছেন জুলুম, ইসলামের জন্য যিনি ত্যাগ করেছেন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, এবং সেই ব্যক্তিটি যদি হয় একজন নারী, যার পিঠ ঝাঁঝরা হয়েছে চাবুকের সপাং সপাং চাবকানিতে, যার পা বেয়ে গলগল করে বেরিয়েছে রক্তের স্রোতধারা; তবু যে নারী মাথা নত করেননি, তবু যে নারী হার মানেননি, আখেরাতে জান্নাত পাবার আশায় যিনি ভোগ করেছেন দুনিয়ার জাহান্নাম; তবে এই আত্মজীবনী স্রেফ কিছু অক্ষরের নাম নয়, নিছক কিছু পাতার নাম নয়, নয় কেবলই একটি বই; বরং তা বিপদের সময়ের সান্ত্বনা, যে বই ঈমানকে ভালোবাসতে শেখাবে; ইসলামের জন্য কারাবাসের দিনগুলিতে যে বই হতে পারে শক্তি।

আবদুল্লাহ আজ্জাম রহ. তার তাফসিরে সুরা তাওবাতে এই বইয়ের কথা আলোচনা করেছেন। ঈমানি বল একজন মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন জায়নাব আল গাজালির কারাবাসের একটি ঘটনা।

আবারও বলি—এই বই স্রেফ একটি আত্মজীবনী নয়; বরং তা ইসলামের জন্য উৎসর্গিত হবার ইতিহাস।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন, জামাল আবদুন নাসের ও জায়নাব আল গাজালি

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যাত্রা শুরু হয় দেশ স্বাধীন করার বাসনা নিয়ে, বিদেশিদের জিঞ্জির ছিন্ন করে ইসলাম নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচবার লক্ষ্যে। ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠা নিয়ে হাসানুল বান্না রহ. তার ডায়েরিতে স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি তখন মিশরের ইসমাইলিয়া শহরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ইসমাইলিয়া শহরে ইংরেজদের বেশ দৌরাত্ম ছিল। হাসানুল বান্না রহ. সেখানকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এবং দেশ-জাতির কল্যাণ ও মুক্তি নিয়ে সময়ে সময়ে বক্তৃতা করতেন। তার সেই বয়ানে প্রভাবিত হয়েই একদিন ছ' বন্ধু তার কাছে

আগমন করেন। তাদের মাঝে দাওয়াত বিষয়ে আলাপ হয়। দেশের মুক্তি নিয়ে কথা হয়। এবং সেদিনই তারা দাওয়াতের কাজ করতে, দেশ ও জাতিকে বিদেশিদের হাত থেকে মুক্ত করতে; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তারা এই মর্মেও প্রতিজ্ঞা নেন যে, 'আমরা কাজ করব ভাই ভাই হয়ে'। প্রতিষ্ঠিত হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিন, মুসিলম ব্রাদারহুড বা মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘ।

শুরুতে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করা ও সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তারা পা বাড়াতে থাকেন রাজনীতির পথে। এবং এটা সরকারের নজরে পড়ে যায়। যার ফলে নিষিদ্ধ হতে হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে। ১৯৪৮ সনের ৮ ডিসেম্বর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নিষিদ্ধ করা হয়।

মিশরে তখন ছিল ব্রিটেনের পুতুল সরকার। ব্রিটেনের অঙ্গুলি হেলনেই মূলত মিশর চলত। ইখওয়ানুল মুসলিমিন দেশ স্বাধীন করার চেতনা জাগ্রত করে দেয় যুবকদের মাঝে এবং ইসলাম অনুযায়ী দেশপরিচালনার কথা যুবকদের বোঝাতে থাকে। তৎকালের পুতুল সরকার তা টের পেয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠনটি নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি করে।

দেশ স্বাধীন করার চেতনা তৎকালের সেনাদের মধ্যেও জাগ্রত হয়েছিল। জামাল আবদুন নাসের সেইসব সেনাসদস্যকে নিয়ে একটি গোপন বিদ্রোহী দল তৈরি করে। যার নাম ছিল 'ফ্রি অফিসার্স মুভমেন্ট'। এই গোপন দলের সাথে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। অভ্যুত্থানের বিষয়ে তাদের মাঝে ঐকমত্য হয়েছিল।

জামাল আবদুন নাসের তার গোপন বিদ্রোহী দলের নেতাদের নিয়ে বড় বড় আলেমদের কাছে যেত—তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আজহারের প্রবাদতুল্য শিক্ষক শায়েখ আওদান রহ.। তার বাড়িতে জামাল আবদুন নাসের এবং আরও ক'জন সেনাসদস্য নিয়মিত যাতায়াত করত। এবং শায়েখ আওদানের সামনেই ইখওয়ান ও ফ্রি-অফিসার্স মুভমেন্ট প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়। তারা এ-ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে, "অভ্যুত্থান সফল হলে দেশ চলবে শরিয়াহ আইনে। তবে ক্ষমতা নিয়ে ইখওয়ানের কোনো মাথাব্যথা থাকবে না। ক্ষমতা চালাবে ফ্রি-অফিসার্স মুভমেন্টই। এবং তা হবে শরিয়ত অনুযায়ী। আর অভ্যুত্থান সংঘটিত হবে মে বা জুন মাসের কোনো এক সময়ে।"

শায়েখ আওদানের বাড়িকে ১৯৫২ সনের ২৩ জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের 'সূতিকাগারও' বলা হয়।

মিশরে ফ্রি-অফিসার্স মুভমেন্টের অভ্যুত্থান হলো। কিন্তু ইখওয়ান আশাহত হলো। শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো না শরিয়তের। যার ফলে জামাল আবদুন নাসেরের সাথে ইখওয়ানের বিরোধ বেধে যায়। এবং শুরু হয় ইখওয়ানের উপর ধরপাকড়,

জেলেজুলুম ও হত্যাযজ্ঞ। শায়েখ আওদান, যার কাছে জামাল আবদুন নাসের ছাত্রের মতো বসে সবক নিত, সেই শায়েখ আওদানকে পর্যন্ত নাসেরি সরকার জেলে দেয়।

এই শায়েখ আওদানের কথা আবদুল্লাহ আজ্জাম রহ. তার সুরা তাওবার তাফসিরে বহুবার উল্লেখ করেছেন। অভ্যুত্থানের পর শায়েখকে জামে আজহারের প্রধান হতে বলে জামাল আবদুন নাসের; কিন্তু শায়েখ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

২

জায়নাব আল গাজালি ইখওয়ানের সদস্য হন ১৯৪৮ সনে; কিন্তু ইখওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক তারও আগে থেকে। তবে হাসানুল বান্নার সাথে জায়নাবের কিছুটা মনোমালিন্য ছিল—যার কথা বইয়ের পাতায় উল্লেখ আছে। তবে সেই মনোমালিন্য এক সময় কেটে যায়। এবং জায়নাব আল গাজালি তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সনের পর থেকে জায়নাব আল গাজালি ইখওয়ানের বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৫৪ সনে নাসেরি সরকারের সাথে ইখওয়ানের চূড়ান্ত সংঘাত বাধে। সে সময় ইখওয়ানিদের উপর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ঝড় বয়ে যায়। তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় নাসেরি সরকার। এবং চলতে থাকে গণগ্রেফতার ও জেলজুলুম। তখন ইখওয়ান-পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ে। সরকারের হাতে নিহত হওয়া ইখওয়ান-কর্মীদের পরিবার দিশেহারা হয়ে যায়। এতিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিধবাদের মাতমে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শূন্য হতে থাকে বাবা-মায়ের কোল।

এই সময়ে জায়নাব আল গাজালি ইখওয়ানিদের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি শায়েখ আওদানের সাথে পরামর্শ করে কাজে নেমে পড়েন। অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ান তিনি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করতে থাকেন। তার নারী সংগঠন বহুসংখ্যক এতিমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

১৯৫৪ সনে যখন ইখওয়ানিদের উপর নাসেরি সরকার হামলে পড়ে, তখন জামাল আবদুন নাসের জায়নাব আল গাজালিকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেছিল। কিন্তু জায়নাব তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার 'নারী সংগঠনকে' সরকারের অধীনস্থ করার কথাও বলা হয়েছিল বারংবার। কিন্তু জায়নাব প্রতিবারই এককথায় না করে দেন। তখন সরকার তার সংগঠন ও পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অবশেষে ১৯৬৫ সনে নাসেরি সরকার তাকে গ্রেফতার করে। ছয় ছয়টা বছর নির্মম নির্যাতন ও অবর্ণনীয় জুলুম সহ্য করতে হয়েছে তাকে। কারাগারে একজন নারীর সাথে এমন পাশব আচরণ হতে পারে, তা হয়তো কল্পনাতেও আসবে না অনেকের।

কারাবাসের সেই দিনগুলি নিয়েই জায়নাব আল গাজালি রচনা করেছেন এই 'স্মৃতিকথা'।

কৈফিয়ত

জায়নাব আল-গাজালির এই বইটির একটি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়—কারাগারের রাতদিন নামে।

গত বছর সেই অনুবাদের একটি পর্যালোচনা লিখেছিলাম। সেখানে অনুবাদ নিয়ে কিছু কথা বলি। সেই সাথে অনুবাদের দুয়েকটা ভুলও তুলে ধরেছিলাম। তা ছাড়া আরও কিছু তথ্যগত ভুল রয়ে গেছে ওই অনুবাদে।

পর্যালোচনা লেখার পর মূল বইটি অনুবাদ করার অফার পাই। অফারটা পাওয়ার পর দু'দিন সময় নিয়েছিলাম। কয়েকটা দিক ভেবে দেখছিলাম। আমি অনুবাদ করলে কেমন হবে, তা একটু যাচাই করে নিয়েছিলাম নিজে নিজে। তারপর কাজটা হাতে নিই।

অনুবাদের ৯৫% কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। তারপর 'বৈচিত্র্যময় কোরআন' নামক কোরআন সম্পর্কিত একটি বই নিয়ে কাজ শুরু করি। বৈচিত্র্যময় কোরআনের কাজ শেষ করে এই অনুবাদটির প্রতি পুনরায় মনোযোগ দিই। বাকি অনুবাদটুকু শেষ করি। তারপর বাকি কাজ শেষ করে ফাইল জমা দিই প্রকাশকের দফতরে।

সেই অনুবাদটিই আসছে কারাবাসের দিনগুলি নাম নিয়ে।

নাশাত পাবলিকেশনের কর্ণধার আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। আমার অনুবাদটাকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর করার প্রতি তার আগ্রহ ছিল চোখে পড়বার মতো। আমার কাছে মনে হয়, তিনি যত বড় না প্রকাশ তার চেয়ে বড় একজন পাঠক। আমার অনুবাদে তার বোদ্ধাদৃষ্টি এবং সুন্দর পরামর্শ কেবল আমার এই অনুবাদের ক্ষেত্রেই নয়; বরং সারা জীবনই কাজে লাগবে।

অনুবাদ নিয়ে কথা

অনুবাদ বেশ জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। স্রেফ ভাষা জানলেই অনুবাদ করা যাবে, এহেন ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। একটি বিদেশি ভাষা নিজ ভাষায় নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেকেই হয়তো ভাবি—'বিদেশি শব্দের বাংলা অর্থটা তুলে দিলেই তো হয়ে গেল অনুবাদ'। হ্যাঁ, অনুবাদ তো হয়ে যাবে; কিন্তু অমন যান্ত্রিক অনুবাদ পড়তে হলে এবং বুঝতে হলে নতুন করে যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে।

আমি আমার 'যোগ্যতা ও অযোগ্যতা' নিয়ে সচেতন। তাই পাঠকদের অনেক আশা-ভরসা দিয়ে মনভোলানো কথাবার্তা বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই—আমি চেষ্টা করেছি। এবং আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি। আমার মাথায় সর্বদাই এটা ছিল যে, পাঠক যেন সাবলীল ছন্দে পড়ে যেতে পারেন।

প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব সুর ও ছন্দ। প্রত্যেক ভাষায় ছন্দ ও সুর অন্য ভাষা থেকে ভিন্ন রকমের। তাই অনুবাদে সাবলীলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সবসময় মূল

লেখার শৈলী ধরে রাখা সম্ভব হয় না। বরং গ্রহণ করতে হয় ভিন্ন শৈলী ও ভঙ্গি। এতে দোষের কিছু নেই—যদি না তথ্যের মধ্যে কোনো গরমিল না করা হয়।

এই বই অনুবাদ করার সময় উপরের বিষয়গুলো মাথায় রেখেছি। আশা করি, পাঠকরা পাঠ করতে গিয়ে কোনো রকম বিরক্তিবোধ করবেন না।

কথা শেষ

শেষ করি চিরাচরিত কথা দিয়ে—মানুষ মাত্রই ভুল। সুতরাং আমার এই কাজেও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার ভুলভ্রান্তি তাই ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখবার অনুরোধ থাকবে। তথ্যের মধ্যে কোনো ভুল পাওয়া গেলে আমাদের জানাতে কসুর করবেন না।

মাআস সালাম।

ইমরান হোসাইন নাঈম
ih9707112@gmail.com

জায়নাব আল-গাজালি।

পুরো নাম জায়নাব আল-গাজালি আল-জুবাইলি। ২ জানুয়ারি ১৯১৭ সনে বাহিরা জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা আজহারের আলেম ছিলেন। জায়নাবের জন্মের দশ বছরের মাথায় তার পিতা ইনতেকাল করেন।

পিতার মারা যাবার পর জায়নাব তার মা ও ভাইদের সাথে কায়রোতে স্থানান্তরিত হন। লেখাপড়ার জন্য রীতিমত তাকে সংগ্রাম করতে হয়। তার বড় ভাই তার পড়াশোনার পক্ষে ছিলেন না। ছোটবেলায় জায়নাব আল-গাজালি সাহিত্যিক আয়েশা তাইমুরিয়াকে পাঠ করেন। এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও হন।

জায়নাব আল-গাজালি ইত্তিহাদে নিসায়ি বা নারী ঐক্য নামক একটা সংগঠনের সাথে পরিচিত হন, যার প্রধান ছিলেন হুদা শা'রাবি। ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে বন্ধন দৃঢ় হতে থাকে। এবং এক সময়ে জায়নাব সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন।

১৯৩৬ সনে ইসলামি দাওয়াত প্রচার ও প্রাসারের জন্য জায়নাব নিজেই একটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যা তার জীবনের একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার বছরখানেকের মধ্যেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। হাসানুল বান্না তার (জায়নাবের) নারী সংগঠনকে ইখওয়ানের অঙ্গসংগঠন বানানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু জায়নাব এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। পরে অবশ্য জায়নাব হাসানুল বান্নার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নারী সংগঠন আখওয়াতুল মুসলিমিন তৈরি হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সনে জায়নাব ইখওয়ানের সাথে সমন্বয় করেন এবং তিনি ইখওয়ানের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হন।

হাসানুল বান্না তৎকালীন মিশরের প্রধানমন্ত্রী মুসতাফা নুহাসের সাথে ইখওয়ানের সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব জায়নাবের কাঁধে দেন। ১৯৫৪ সনের দুর্ঘটনার বছর গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানিদের পরিবারের সেবা করার পেছনেও বড় অবদান রেখেছেন জায়নাব।

জামাল আবদুন নাসেরের সময়ে তার মুসলিম নারী সঙ্ঘকে সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের অনুগামী করার অর্ডার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তার সংগঠন নিষিদ্ধ করার রুল জারি হয়। তারপর ১৯৬৫ সনের আগস্ট মাসে তিনি গ্রেফতার হন। টানা ছ' বছর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও জুলুমের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইয়ামুম মিন হায়াতি', যার অনুবাদ আমরা পাঠকের সামনে পেশ করছি 'কারাবাসের দিনগুলি' নামে।

ভূমিকার কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লামা।

কারাবাসের দিনগুলি বইটি লিখতে মানসিক দ্বন্দ্বে ছিলাম। প্রচুর দোদুল্যমানতা ছিল; তবে ইসলামের বিষয়ে যাদের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, যারা আমার ছেলে ও ভাইতুল্য দাওয়াতের অগ্রসৈনিক; এবং এই চিন্তাধারা লালন-করা-আমার মেয়েরা, যারা ওই দিনগুলোতে আমার সাথেই ছিল, তারা এই লেখাকে আমাদের উপর ইসলামের হক মনে করেছে যে, আমরা ওই সময়টাকে কলমবন্ধ করে রাখব, যখন ইসলামি দাওয়াত পূর্বে ও পশ্চিমে নাস্তিক্যবাদ ও বাতিল শক্তির মোকাবেলা করছিল, যে বাতিল শক্তি স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল হকের কালিমা ও তার ঝান্ডাবাহীদের এবং ওই সকল বুঝবান ও সমঝদার দায়ীদের, যারা সত্য ও প্রবল প্রতাপের সাথে লড়াই করছিলেন। কেননা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে; সুতরাং তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এমনই ছিল তাদের অভিপ্রায়।

মুসলিম উম্মাহকে তার সকল উপাদান নিয়েই ইসলামের ভূমিতে ফিরতে হবে—যাতে তাওহিদ-ইলম-মারেফাত ও আল্লাহর সাথে বাস্তবিক সম্পর্কের সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যকার প্রকাণ্ড চিত্র বাস্তবায়ন করা যায়। তখন জাহিলি সমাজ, যা মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করেছে এবং কথার তুবড়ি ছুটিয়ে তাকে ব্যস্ত রেখেছে, আল্লাহর পথ- হকের পথ থেকে; তা গুটিয়ে যাবে। এই দায়ীরা তখন মানুষের অপকর্ম ও আল্লাহর শরিয়ত বাদ দিয়ে জমিনের তাগুতের শরিয়ত অনুসরণ করে তার উপাসনা করা থেকে জমিন পবিত্র করবেন। জীবন তার পূর্ণ স্পন্দন নিয়ে তখন ফিরে আসবে—যে জীবনধারা বহমান ছিল নববীযুগে এবং তার বরকতময় সাহাবিদের যুগে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়িন। তারা ছিলেন ওই মানবকাফেলা, যাদের মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছিল।

ইসলাম ছাড়া এই জাতির কোনো গতি নেই, ইসলামহীন এই পৃথিবী কাঙাল। জেলের ঘানি, শাস্তির প্রচণ্ডতা, চাবুকের সপাং সপাং চাবকানি দাওয়াতের মুখলিস ছেলে-মেয়েদের শক্তি, দৃঢ়তা ও বাতিল প্রতিরোধ করার ধৈর্য বরং বৃদ্ধি করে দিয়েছে, আমরা যার প্রতীক্ষায় থাকি।

আমাদের পূর্বে যারা হকের পথ মাড়িয়েছেন, তাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ; চাবুকের কারণে পথ হারায় না। কিন্তু দলিল দিয়ে দলিল ও মতামত দিয়ে মতবাদ বদলানো যায়। কথার পিঠে আসে কথা।

চাবুক হাতে উন্মাদ ও অন্ধ লোকদের শক্তি খতম হয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত বাতিল দ্বারা আক্রান্ত ও চাবুকের দম্ভে উন্মাদ লোকদের ভ্রান্তি ও জাহালাত থেকে সরিয়ে সিরাতে মুসতাকিমে নিয়ে যাওয়া দুরূহ বিষয়।

হকের পথ একটাই। আর তা হলো আল্লাহ ও তার নবী ও তার রাসুলগণ এবং রাসুলদের ওয়ারিশদের পথ।

আর বাতিলের পথ ও মত অজস্র। বাতিলের প্রতি মোড়ে শয়তান দাঁড়িয়ে বাতিলের অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদেরকে নিজের পথে নিয়ে যায়। 'আর এটাই আমার সিরাতে মুসতাকিম। তোমরা এর অনুসরণ কর। অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। তবে শয়তান তোমাদের নিয়ে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' (সুরা আনআম, ১৫৩)

বর্তমানে এই ভ্রান্তি ও মানবীয় 'দানব' থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে, হকের মানহাজ, আল্লাহর মানহাজ, মুহাম্মাদী মানহাজ গ্রহণ করা, যেই মানহাজ কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত।

আমি তো উম্মাহর জাগরণের এবং সেই সমাজের প্রত্যাবর্তনের- যা তাওহিদের মহিমায় মানবীয় কচকচানিকে (যে নাস্তিক্যবাদী ঢেউ আমাদের দেশে আছড়ে পড়ছে) ছাড়িয়ে যাবে; ইনশাআল্লাহ আমি সেই নুসরাতের লক্ষণ ও তার আভাস দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, আমি তার আশু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আরও দেখছি এগুলো জাহিলিয়াতের আস্তাকুড়ে ফেলে দিচ্ছে মানুষের বানানো চিন্তাধারাকে।

আমি অচিরেই সেই কাজের নিদর্শন দেখব, যার দায়িত্ব 'মানুষের জন্য প্রেরণ করা' উম্মাহকে দেওয়া হয়েছে। শাহাদাতু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ, এই কালিমায় দায়বদ্ধ কার্যক্রমের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

তবে হ্যাঁ, আমাদের সময়ের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। এটা হতে পারে বছরের পর বছর; বা যুগের পর যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী। দাওয়াত ও উম্মাহর কাছে এগুলোর কোনো ধর্তব্য নেই। আসল বিষয় হলো, আমরা হকের পথে অবিচল আছি। সহজ-সরল পথ চলায় আমরা বিশ্বাসী আছি।

আমাদের এই বিশ্বাস যে, আমরা হকের উপর আছি। আমরা শুধু পুরোনো ভিতে নতুন ইট সংযোজন করছি। সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে আমরা যেন সংকীর্ণমনা, লজ্জিত ও দ্বিধান্বিত না হই আমাদের আকিদার কারণে, যে আকিদা হচ্ছে আকিদাতুত তাওহিদ, আকিদাতুল আমাল, আকিদাতুল বায়ান, সমগ্র মানুষের জন্য হকের বয়ান; প্রত্যেক মানুষের কাছে আমাদের আকিদা বলতে আমরা যেন লজ্জিত না হই।

আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের জেল-জুলুমের প্রতিটা মুহূর্তই ইতিহাসের অংশ। এবং যারা এই পথে আছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেইসব মুহূর্ত সংরক্ষণ করা এবং পাঠ করা, যাতে তারা সংগ্রামের পথে অটল থাকতে পারে। তাদের কাজ যেন অনর্থক কচকচানি ও কেবল ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জিতে পর্যবসিত না হয়। এই বিশ্বাস নিয়েই, আমার মুখলিস সন্তানদের পরামর্শেই আমি এই কাজে নেমেছি। আমার স্মৃতি যা

ধারণ করেছে, সেই বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছি। যদিও পুঙ্খানুপুঙ্খ সব উল্লেখ করা কঠিন...

আমার স্মৃতিশক্তির প্রমাণ এতেই হয়ে যাবে যে, আমি জল্লাদদের পরিচয় ও শাস্তির প্রকারভেদসহ উল্লেখ করব। যেমন, ওরা এই শাস্তিকে জাহান্নাম বলেছিল। এই জাহান্নাম ছিল পুরুষদের নাড়িভূড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো। এই আজাবে থাকা লোকেরা চিৎকার দিয়ে বলেছিল, হে দুনিয়ার মানুষ, ইসলাম কেবল নামের বিষয় নয়। ইসলাম হচ্ছে মানার নাম, পথ চলার নাম।

আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তিনি আমাকে পূর্ণাঙ্গ অথবা সামান্য চিত্র হলেও পেশ করার তাওফিক দান করবেন। এবং যাতে এই আত্মকথা মুখলিসদের জন্য হক, নুর ও হেদায়েতের মশাল হয়। আমরা যেন আমাদের পথচলার জন্য সিরাতে মুসতাকিমের পথ রচনা করতে পারি। এই সিরাতে মুসতাকিমের পরিচয় আবারও দিচ্ছি, বেশ জোর দিয়েই বলছি যে, তা হচ্ছে রাসুল ও নবীদের রিসালাত, যাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছে। তার শরিয়তের মাধ্যমে 'হক' বান্দার জন্য কর্মপন্থা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তার পূর্বের শরিয়তকে বাতিল করে দিয়েছে। এবং একেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে স্বচ্ছ হাকিকত রূপে। 'এখন যার খুশি ঈমান আনুক আর যার খুশি কুফরের পথ গ্রহণ করুক।'[১]

যারা পথের যন্ত্রণা সহ্য করেছে, আল্লাহর ইচ্ছায় যারা কোরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তারা কখনোই হক ও দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না— যতক্ষণ না উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবতা থিতু হয় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের পতাকাতলে।

আমরা হকের উপর আছি এই আশায় যে, অচিরেই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে এর প্রতিদান পাবো। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তার জানমাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। নিহত করবে ও নিহত হবে। এই ওয়াদা তওরাত ইঞ্জিল ও কোরআনে সত্য সত্য দেওয়া আছে।'[২]

আমাদের পূর্বে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের প্রতি প্রীতি সম্ভাষণ, এবং এই অবগতি ও ওয়াদা জ্ঞাপন করছি যে, আমরা হকের পথে আছি। ওই সকল লোকের প্রতিও আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম, যাদের অন্তরে কণাপরিমাণ হলেও কল্যাণ আছে, হয়তো আল্লাহ এর ওসিলায় তাদের মাফ করবেন এবং হেদায়েত দান করবেন।

'তোমরা তা-ই ইচ্ছা করবে যার আল্লাহ ইচ্ছা করবেন।'[৩]

জায়নাব আল গাজালি

---

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত ১২৯

[২] সুরা তাওবা, আয়াত ১১১

[৩] সুরা দাহর, আয়াত ৩০

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত আক্রমণ : ২১
আমি ও সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন : ২৪
তাগুতকে না, না, না : ২৬
এখন করবটা কী? : ২৮
দেনদরবার অতঃপর প্রবঞ্চনা : ২৯
বাদুড়ের দল : ৩০
সবাই যেন আহমদ রাসেখ : ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি বাইয়াত এবং তারপর... : ৩৯
খুলে গেল অবগুণ্ঠন : ৪৩
দায়িত্বের ডাক : ৪৫
চলতি পথে আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সঙ্গে... : ৪৭
কাজের অনুমতি : ৪৯
স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া : ৫১
ইমাম সাইয়েদ কুতুব শহিদের সঙ্গে দেখা : ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

চক্রান্ত : ৫৯
এবার আমার পালা : ৬২
২৪ নং সেলের দিকে : ৬৫
২৪ নং সেলে : ৬৭
সেল নম্বর তিন : ৬৮
স্বপ্ন : ৬৯
কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন : ৭৫
অনবরত শাস্তি ও দরবার : ৭৬
প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি : ৮০
আমার সেলে উজ্জ্বল কিছু মুখ! : ৮২
রাফাত মুসতফা নুহাসের মৃত্যু : ৮৩
খাবার একটি ইবাদত : ৮৬
দেনদরবার ও শাস্তির রাত : ৮৭

দরবারের রাতে এল হামজার পালা : ৯১
সেলে ফেরা : ৯৩
আরেকটি রাতের আগমন : ৯৪
সামান্য বিশ্রাম : ৯৬
কী ভীষণ রাত : ৯৭
কাপড়ের ব্যাগ ও আবদুন নাসেরের চিঠি : ১০০

চতুর্থ অধ্যায়

শামস বাদরানের সাথে টর্চার-সেলে : ১০৫
পানির সেল : ১১০
অপরাধ : ১১৪
দ্বিতীয়বার পানির সেলে : ১১৬
আমার সেলে শয়তানের নৃত্য : ১১৭
ইঁদুর থেকে পানির সেল : ১১৯
পানির সেল থেকে অ্যাটর্নির কাছে : ১২২
রুটির সাথে চাবুক : ১২৫
হাসপাতালে : ১২৬
সেই শামস বাদরান : ১২৭
চাপ প্রয়োগের নাটক : ১৩০
৩২ নম্বর রুম : ১৩২
ঈমানের উচ্চতা ও বাতিলের অপদস্থতা : ১৩২
আবদুন নাসের আমার ফাঁসির আদেশ দিল : ১৩৫
পাশার অফিসে : ১৩৭
বিরাট বিভ্রাট : ১৪০
শামস বাদরানের ভ্রষ্টতার জেদ : ১৪৪
প্রবৃত্তির দাসত্ব : ১৪৯
হাসপাতালের আজাব : ১৫১

পঞ্চম অধ্যায়

ফেরাউনের উপস্থিতি : ১৫৭
চক্রান্তের মূল : ১৫৯
মুহাম্মদ কুতুব : ১৬৪
আদালতে : ১৬৮
আদালতের তদন্ত বিভাগ : ১৬৯
দ্বিতীয়বার অ্যাটর্নির কাছে : ১৭২
তদন্তের অফিসে পুনর্বার : ১৭২
শাস্তি : ১৭৩

সম্পদ : ১৭৪
কিমা গোশতের বয়াম : ১৭৯
হাসপাতালেও মানবেতর জীবন : ১৮০
পশুত্বের পরাজয় : ১৮১
রায়ের দিন ঘনিয়ে এল : ১৮২
সুসংবাদ : ১৮৪
সাত মামলার প্রথম মামলার নির্ধারিত দিন : ১৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবার আদালত : ১৯১
জাহিলিয়াত থেকেও মূর্খ : ১৯৩
রায় ঘোষণা : ১৯৩
আল্লাহর সন্তুষ্টিতে কিছু সময় : ১৯৪
ফাঁসির আগে শেষ বোঝাপড়া : ১৯৫
তাগুত রায় বাস্তবায়ন করল : ১৯৬
রায়ের পর সামরিক জেলে কিছুদিন : ১৯৭
আমার স্বামীর মৃত্যু : ১৯৮
আমাদের সাথে নতুন প্রতিবেশী : ২০১
আবদুন নাসেরের বিচার হওয়া উচিত : ২০১

সপ্তম অধ্যায়

কানাতির জেলে স্থানান্তর : ২০৫
মানসিক কষ্টের রাত : ২০৭
নতুন সঙ্ঘাত : ২০৮
শত্রুতা ও মানবতা : ২১৩
স্বেচ্ছাচারীর মৃত্যু-ভাবনা : ২১৪
কেঁপে উঠল পাপিষ্ঠরা : ২১৯
নতুন পরীক্ষা : ২২০
শেষ বোঝাপড়া : ২২১

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত আক্রমণ

সময়টা শীতকালের এক বিকেল।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সনের প্রথম দিক। বাড়িতে ফিরছিলাম। তখনই একটা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে উলটে যায় আমার গাড়িটা। প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার জ্ঞান যায় যায় অবস্থা। ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। চারিপাশে ঘটে যাওয়া কিছুই বুঝতে পারছিলাম না; একটা লোকের আওয়াজ ব্যতীত—যে আমার নাম ধরে ভয়ার্ত গলায় ডেকে যাচ্ছিল। আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরলে নিজেকে আবিষ্কার করি হিলিও পুলিস হাসপাতালে। পাশে আমার স্বামী, সহোদর ও সহোদরারা ও দাওয়াতি ভাই-বোনরা ছিল। সবার মুখে লেপ্টে ছিল ভয় ও বেদনা—মুখের ভাষা পড়তে গিয়ে যা বুঝলাম। প্রথমবার চোখ খুলতেই বিড়বিড় করে বলছিল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এই সময় বিড়বিড় করে আমি যেন জিজ্ঞেস করছিলাম 'কী হয়েছে'! তবে তা ছিল কিছু সময় মাত্র। দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারাই আমি।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি একজন মহিলা ডাক্তার দুজন পুরুষ ও দুজন নারী নার্স নিয়ে ঢুকছে। আমাকে এক্সরের কামরায় নিয়ে যাবে। মনে পড়ে গেল 'কী হয়েছিল'। শুনলাম আমার স্বামী বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া কর তুমি'। ড্রাইভারের খবর জানতে চাইলাম। শুনলাম আল্লাহর রহমতে সে ভালো আছে। হাসপাতালেই তার চিকিৎসা চলছে। পরে অবশ্য জেনেছি, তার মগজে ঝটকা লেগেছিল।

আমাকে এক্সরে-ঘরে নেওয়া হলো। দেখা গেল উরুর হাড় ভেঙে গেছে। আমার গোড়ালি লোহার বেড়ি দিয়ে আটকে রাখা হল। ঠিক হলো অস্ত্রোপচার করা হবে। আমাকে তাই নেওয়া হলো মাযহার আশুর হসপিটালে। সার্জন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আমার অপারেশন করবেন।

সরঞ্জাম প্রস্তুত করা বাদেই অপারেশন করতে লেগে গেল পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা।

বিপদ নিয়েই কিছুদিন কাটল।

তারপর বিপদ কেটে যায়। চারিদিকে কী বলা হচ্ছে না হচ্ছে, সেই খবর সংগ্রহ করতে লাগলাম, যা থেকে স্পষ্ট হচ্ছিল আমাকে হত্যা করতেই জামাল আবদুন নাসেরের গোয়েন্দারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। পরবর্তী নানান ঘটনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে।

মুসলিম যুবকদের একটা দল প্রতিনিয়ত আমাকে দেখতে আসত—আশ্বস্ত হবার জন্য। তাদেরকে নিয়ে আসতেন ভাই আবদুল ফাত্তাহ আবদুহু ইসমাইল শহিদ।[৪] এই কথা জানতে পেরে আমি তাকে বলি, যুবকরা যেন আমাকে দেখতে কম আসে। তার জবাব ছিল, এই চেষ্টা তিনি নিজেও করেছেন। কিন্তু তারাই বেঁকে বসে এবং আমাকে দেখতে আসতে গোঁ ধরে।

এক দিনের কথা।

মুসলিম নারী সঙ্ঘের নির্বাহী সেক্রেটারি এলেন। তার হাতে কিছু ফাইলপত্র। সংগঠনের সভানেত্রী হওয়ায় আমাকে তা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। ঘরে তখন আমার স্বামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রধান উপদেষ্টা উসতাদ হুদাইবির স্ত্রী ছিলেন। দেখলাম, সেক্রেটারি কাছে এসে ফাইল দেবার আগেই আমার স্বামী দ্রুত উঠে তার কাছে গেলেন। তার হাত থেকে ফাইল নিয়ে তাকেসহ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তাকে কিছু বলছিলেন, যা থেকে বুঝলাম যে, ইতোপূর্বেও তিনি এই কাগজগুলো আমার সামনে আনতে নিষেধ করেছেন। বিষয়টা বেশ অবাক করল আমাকে। আমার স্বামীকে 'কারণ' জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি কথা ঘুরিয়ে বললেন, ডাক্তার আবদুল্লাহ, যিনি আমার চিকিৎসার দায়িত্বে আছেন, তার কথা মতো চলতে হবে।

এই বলেই আমার স্বামী ডাক্তারের কাছে গেলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই ডাক্তার এসে আমার পা চেক করলেন এবং সকল কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলে গেলেন। সংগঠনের কাগজপত্র ও খবরাদি আসা যে ডাক্তারের নিষেধ, আমার স্বামী সেটাই প্রমাণ করতে চাইলেন। আমি যখন যুক্তি দিয়ে বললাম, 'সইসাবুদ করলে এমন কী আর হবে!' কিন্তু তবু কোনো কাজ হলো না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল।

ডাক্তারের কাছে আবেদন জানালাম যেন বিছানায় বসেই সংগঠনের কিছু কাজ করতে পারি। কিন্তু তিনি না করে দিলেন। আমার ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হলো যে, এখানে কোনো একটা 'কিন্তু' আছে। আমার স্বামী, সেক্রেটারি ও সাক্ষাতকারীরা; সকলেই আমার থেকে তা গোপন করছে। এমনকি মুসলিম নারী সঙ্ঘের প্রশাসনিক সেক্রেটারি, যিনি প্রায়শই আমাকে দেখতে আসতেন; তিনিও। সংগঠন নিয়ে আমার প্রশ্নে তার উপস্থিত জবাবেই বুঝতে পারতাম যে, তিনি কিছু একটা গোপন করছেন।

---

[৪] আবদুল ফাত্তাহ আবদুহু ইসমাইল : ১৯২৫ সনে দিময়াত জেলার অন্তর্গত কুফরুল বিত্তিখ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন আবদুল ফাত্তাহ আবদুহু ইসমাইল। ১৯৫৪ সনের ব্যাপক ধরপাকড়ের পরে ইখওয়ানকে পুনরায় সংগঠিত করতে যে তিন ব্যক্তি কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে আবদুল ফাত্তাহ আবদুহু ইসমাইল একজন। সাইয়েদ কুতুবের সাথে তারও ফাঁসি কার্যকর হয়।

এক বিকেলে সেক্রেটারি সাহস সঞ্চয় করে আমার কাছে এলেন গোপন-করা বিষয়টি প্রকাশ করতে। আমার স্বামীর কারণে তা প্রকাশ করা বাস্তবেই কঠিন ছিল। আমাকে সাহস দিয়ে, ধৈর্যধারণ ও শান্ত থাকার কথা বলে তিনি কিছু কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। তাতে লেখা—মুসলিম নারী সঙ্ঘের সাধারণ মারকাজ সিলগালা করা হলো।

সেক্রেটারি আমাকে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন, ম্যাডাম, আপনার জন্য বিষয়টি আসলেই মর্মন্তুদ।

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সংগঠন বন্ধ করা তো সরকারের কাজের মধ্যে পড়ে না। এটা তো একটা ইসলামি দল।

তিনি আমাকে বললেন, সরকারকে এই কথা বলার মতো কেউ নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আবদুন নাসের সংস্থাটি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সে ব্যক্তিগতভাবেই আপনাকে অপছন্দ করে, আপা! এমনকি কারুর মুখে আপনার নামটা পর্যন্ত শুনতে সে প্রস্তুত নয়। আপনার নাম উঠলেই সে রাগান্বিত হয়, ক্ষ্যাপে যায়, সেখানেই শেষ হয়ে যায় সাক্ষাতকার।

প্রশংসা আল্লাহর, আমি বলতে লাগলাম, যিনি নাসেরকে আমার প্রতি ভীত বানিয়েছেন এবং সে আমাকে অপছন্দ করে। আমি তাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি। তার স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের, আমরা সংগ্রামী দলকে; নিজেদের কাজে অটল থাকার ও আজীবন দাওয়াতের সঙ্গে থাকার স্পৃহাই কেবল বাড়াবে। এটা তো তাওহিদের দাওয়াত। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় অচিরেই আমরা বিজয়ী হবো। দাওয়াতের পথে শাহাদাত বরণ করা তো আমাদের জন্য একটা মামুলি বিষয়। মুসলিম নারী সঙ্ঘকে বন্ধ করার কোনো অধিকারই নেই আবদুন নাসেরের। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের ঝান্ডা দৃঢ় রাখবেন। কোনো মানুষ নয়; বরং আল্লাহই এ কাজ করবেন।

অশ্রুসজল চোখে সেক্রেটারি বললেন, আপা, বিষয়টা অত্যন্ত খতরনাক। আল্লাহর কাছে কামনা করি যেন সংস্থাটি বন্ধ না হয়। আপনার এই কথা রেকর্ড করা হতে পারে। হয়তোবা ইতোমধ্যে তা রেকর্ড হয়ে গেছে। কাছেপিঠেই রাখা থাকতে পারে কোনো টেপ রেকর্ডার।

এই বলেই সেক্রেটারি ফিসফিস করে বললেন, ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে ছোট একটা জিনিস চাইব। তা হলো, এই কাগজে একটা সই। আপনি সই করলেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।

কাগজটা দেখাতে বললাম তাকে। দেখলাম, সেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক ঐক্য ফ্রন্টে যুক্ত হবার ফরম। তাকে বললাম, কখনোই নয়, আল্লাহর কসম, আমার হাতে পচন ধরুক যদি আমি এমন কিছুতে সই করি, যা আমাকে আল্লাহর সামনে ছোট করে দেবে; কেননা আমি তাগুত জামাল আবদুন নাসের, যে কিনা আবদুল

কাদের আওদাহ ও তার সঙ্গীদের হত্যা করেছে, তার হুকুমত মেনে নিয়েছি। যারা তাওহিদবাদীদের রক্তে হাত ডুবিয়েছে, তারা হচ্ছে আল্লাহ ও মুমিনদের বিবাদী। এর চেয়ে আমাদের জন্য সম্মানজনক হচ্ছে 'নারী সঙ্ঘের সাধারণ কার্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া'।

সেক্রেটারি কাঁদতে কাঁদতে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, আমাকে আপনার মেয়ে মনে করে আস্থা রাখেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, তবে এই আলোচনা বাদ দিন।

আমি বললাম, এই বিষয়টাই বাদ। আর আমি কখনোই এই কাগজে সই করব না। এর মধ্যে তো তাগুতের প্রতি সমর্থন আছে। এটা হতে পারে না। আল্লাহ তার বান্দার জন্য যা নির্বাচন করেন, তা-ই করবেন।

হাসপাতালের দিনগুলো কেটে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম। চিকিৎসা চলছিল।

আমি ও সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন

বাড়িতে প্রতিদিনই সেক্রেটারি মেয়েটা আমাকে দেখতে আসত। সে জানাল, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছে। শুনে বড় অবাক হলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কীভাবে হতে পারে? সে বলল, আমি জানি না। হয়তো এটা আপনার কাছে পৌঁছবার জন্য নতুন কোনো ফন্দি।

সাংগঠনিক সেক্রেটারি আমার কাছে 'দেখে দেওয়া'র ও 'সই করা'র জন্য বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে আসত। আমিও বাড়িতে বসে মুসলিম নারী সঙ্ঘের সাধারণ পর্ষদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এরই মধ্যে এক দিন উরুর প্লাস্টার খোলার জন্য হাসপাতালে যাই। ততদিনে ইমাম সাইয়েদ কুতুব শহিদকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি এবং ইখওয়ানের কিছুলোক হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসেন।

একদিন হঠাৎই ডাক-যোগে একটি রেজিস্ট্রি খাম পাই। তাতে একটি কার্ড ছিল। নিম্নের কথাগুলো লেখা ছিল তাতে—

আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন। স্বাধীনতা, সংহতি, সাম্যবাদ।

নাম ও পরিচয় : জায়নাব আল গাজালি আল জুবাইলি। প্রকাশ : জায়নাব আল গাজালি।

পেশা বা পদবি : মুসলিম নারী সঙ্ঘের সভানেত্রী।

ইউনিট : আল-বাসাতিন। আলমাযা।

বিভাগ : নয়া মিশর।

জেলা : কায়রো।

ডাক-যোগে এই কার্ডটি আসে। এর সঙ্গে ১৯৬৪ সনের সাম্যবাদের যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছু লেখা ছিল। মিশরের অবস্থা চিন্তা করে কাষ্ঠহাসি হাসলাম আমি। আমার মনে পড়ল, যে স্বাধীনতায় আমরা বাস করতাম, তাদের সামরিক অভ্যুত্থান তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

হাসপাতালের চিকিৎসা শেষে বাড়িতে ফিরলাম।

সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের জন্য অব্যাহতভাবে দাওয়াতনামা আসতেই থাকে; কিন্তু নেতিবাচক অবস্থানে থাকব বলে ঠিক করি। কিছুদিন পর ডাক্তার আমাকে বাইরে বেরিয়ে নারী সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের কাজগুলো ধীরে-সুস্থে আঞ্জাম দেবার অবকাশ দিলেন। তখনও আমি ক্রাচে ভর করে হাঁটি।

একদিন সকালের কথা।

আমি তখন নারী সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে বসে ছিলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। সেক্রেটারি বলল, সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। রিসিভার তুলে বললাম, আস-সালামু আলাইকুম। অপর পাশ থেকে সালামের জবাব এল। তারপর আমি বললাম, জি, কী চান?

সে জানতে চাইল আমি জায়নাব গাজালি কি না! আমার সম্মতিসূচক জবাব পাওয়ার পর সে বলল, আমরা সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন থেকে বলছিলাম। বিমানবন্দরে আবদুন নাসেরকে স্বাগত জানানোর জন্য সংগঠনের পতাকা হাতে আপনারা যাবেন, ইনশাআল্লাহ। সংগঠনের সকলে বিশেষ করে সর্বাগ্রে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে সম্মানিত ও আলোকিত করবে।

আমি বললাম, আল্লাহ যা চান, তা-ই করবেন।

সে বলল, আমরা, পরিচালনা পর্ষদ ও ঐক্যফ্রন্টের একটা বড় সংখ্যক লোক সেখানে যাব। আপনি বললে আপনাদের সৌজন্যে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি।

ধন্যবাদ বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

দু'দিন কি তিনদিন পর আবার ফোন আসে সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন থেকে। এবার ছিল একটা মেয়ে। বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে না-যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল সে। আমি বললাম, মুসলিম নারী সঙ্ঘ ও ঐক্য ফ্রন্টের সদস্যরা ইসলামি বিধানের প্রতি নিষ্ঠাবান। তারা এই ধরনের হাঙ্গামাপূর্ণ স্বাগত-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না, বুঝলে মেয়ে!

সে বলল, কথাটা তবে কী দাঁড়াচ্ছে, মিসেস জায়নাব? মনে হচ্ছে আপনি আমাদের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী নন? আপনি সংগঠনের লোকদের কাছে এই আহ্বান পৌঁছানোর পর কি তারা মানা করে দিয়েছে?

বললাম, আমি তো নিজেই এই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কেননা তা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি। তবে কীভাবে তাদের কাছে এই আহ্বান পৌঁছাব?

সে বলল, আপনি তো স্পষ্ট আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ করছেন।

আমি বললাম, আমরা কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার নিগড়ে বাঁধা। আমরা আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ভালো ও তাকওয়ার কাজে আমরা পরস্পর সাহায্য করি—যেমনটা আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন। আর ফোনে এ ধরনের আলাপ চলে না।

সে বলল, আপনি আমন্ত্রিত। আলাপটা বোঝার জন্য আবিদিন ময়দানে অবস্থিত 'সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নে'র সেন্টারে আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব।

তাকে বললাম, আমি অসুস্থ। পায়ের চিকিৎসার কারণে আমার চলাফেরা সীমিত। তুমি চাইলে আমাদের মুসলিম নারী সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে এসে আমাদের ধন্য করতে পারো।

সে বলল, ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের অফিস হয়ে যান। আপনি তো সমাজতন্ত্রেরই একজন সদস্য, তাই নয় কি?

আমি বললাম, আমি নারী সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের সদস্য। আচ্ছা মেয়ে, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

এই বলে কথা শেষ করলাম। সেখানে যাইনি আমি।

এই ফোনালাপের সপ্তাহখানেক পরে সংগঠনের সেক্রেটারি একটি সরকারি নোটিশ রাখল আমার সামনে, যাতে তারিখ লেখা ১৫/৯/১৯৬৪। ৬/৯/১৯৬৪ সনের মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্ত ছিল তাতে। সিদ্ধান্ত নম্বর ১৩২। পুনর্বার নারী সঙ্ঘের সাধারণ পর্ষদ বন্ধের নোটিশ এটা।

তাগুতকে না, না, না

১৩৮৪ হিজরির ৯ জুমাদাল উলা মোতাবেক ১৫/৯/১৯৬৪ সন, যেদিন নিষিদ্ধ ঘোষণার নোটিশ এল, সেদিনই তৎক্ষণাৎ মুসিলম নারী সঙ্ঘের বৈঠক বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানা হবে না এবং সংগঠন ও তার আসবাবপত্র এমন কোনো সংগঠনের কাছে হস্তান্তরও করা হবে না, যারা আবদুন নাসেরের অভ্যুত্থানের পূর্বে, সাধারণ কিছু মতপার্থক্যের কারণে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। অভ্যুত্থানের পর এই বিচ্ছিন্ন দলটা এখন আবদুন নাসেরেরই চামুণ্ডা। মজলিসে এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটা ব্যতিক্রমধর্মী "ত্বরিত বৈঠকের" জন্য সাধারণ পরিষদকে আহ্বান করা হবে।

সাধারণ পর্ষদ একত্রিত হলো। সেখানেও সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করার এবং বিষয়টা আদালতে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আইনজীবী আবদুল্লাহ রিশওয়ানকে ওকিল নিযুক্ত করি আমরা। সংগঠন তারবার্তার মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র-

প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণমন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে লিখিত বক্তব্য এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বক্তব্যের ফটোকপি পাঠায়। সেখানে আমরা সাফসাফ নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে দিই।

নারী সঙ্ঘ ১৩৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইসলামি দাওয়াত প্রচার এবং মুসলিমদেরকে তাদের রবের কিতাব ও নবীর সুন্নাহর দিকে ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে। আমাদের উপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কোনো অধিকার নেই। অধিকার এক আল্লাহর এবং যারা তার দীন কায়েম করবে ও তার শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করবে; অধিকার আছে তাদের।

আবদুন নাসের তখন সংগঠন নিষিদ্ধকরণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে আরও তোড়জোর শুরু করল। যেমনটা সে ইতোপূর্বে কোন এক অজানা কারণে "আস-সাইয়্যিদাত আল-মুসলিমাত" পত্রিকা, আমি যার নির্বাচক ও প্রধানসম্পাদক ছিলাম; বন্ধ করতে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। হয়তো জায়নাব আল গাজালি থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা শয়তানকে খুশি করে আল্লাহর দাওয়াত বন্ধ করতেই সে এহেন কাজ করেছিল।

তাগুতের দোসররা নারী সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের বাড়িটাও দখল করে নিয়েছে। এর মাল-সামানা সব জব্দ করে। একশত বিশজন এতিম মেয়ে ও কন্যাশিশুকে রাস্তায় বের করে দেয়—নারী সঙ্ঘ যাদের দায়িত্ব নিয়েছিল। তাদের থাকা-খাওয়া ও শিশু শ্রেণি থেকে নিয়ে ভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়ার আনুষঙ্গিক সকল খরচ 'সংস্থা' বহন করত। আমি বুক ফুলিয়ে বলতে চাই যে, তাগুতের দোসররা মুসলিম নারী সঙ্ঘের একজন সদস্যকেও, পরিচালনা বিভাগ বা সাধারণ বিভাগ অথবা বক্তাদের মধ্যে কাউকেই; তাদের দলের প্রতি আগ্রহী পায়নি। তারা আমাকে বলেছিল, নিজে উপস্থিত থেকে তাদের হাতে বাড়ি বুঝিয়ে দিতে। আমি না করে দিয়েছি। বাড়ির বাকি সকল সদস্যের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। ওরা কেবল প্রশাসনিক সেক্রেটারিকে পেয়েছিল। সে তো একজন চাকুরে মাত্র। তার হাতে বাড়ির বা সংগঠনের স্বত্বাধিকার ছিল না। তাই সে তা বুঝিয়ে দেওয়ার অধিকারও রাখে না।

আমি এখানে সাধারণ পর্ষদের বৈঠকে তৈরি করা বক্তব্যের কিছু অংশ, যে বক্তব্য সাধারণ পর্ষদ সরকারপ্রধান, অ্যাটর্নি জেনারেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়েছিল; এখানে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না—

"মুসলিম নারী সঙ্ঘ ১৩৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় দাওয়াত প্রচার ও মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করতে, যা ইসলামকে তার হারানো সম্মান ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে—যেই ক্ষমতা আল্লাহর ছিল এবং যা আল্লাহরই থাকবে। মুসলিমদের উপর কোনো সমাজতন্ত্রী শাসকের কোনো কর্তৃত্ব নেই।...

সুতরাং মুসলিম নারী সঙ্ঘের মিশন হচ্ছে, ইসলামের দিকে আহ্বান এবং আল্লাহর পাঠানো রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন ও আল্লাহর রিসালাতের দ্বারা শাসন করা দাওলা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে সৈনিকরূপে গড়ে তোলা।

"আমরা-মুসলিম নারীরা- এই নিষেধাজ্ঞা মানি না। সরকারপ্রধান- যিনি সরাসরি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন- আমাদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়েরও নেই এমন কোনো ক্ষমতা। দাওয়াত কোনো সম্পদ বা তুচ্ছ বস্তু নয় যে, তাকে সমাজতন্ত্রী সরকার—যারা আল্লাহ ও তার রাসুল এবং মুসলিম উম্মাহর দুশমন—বাজেয়াপ্ত করবে। এই সরকার আমাদের সম্পদ ও তুচ্ছ জিনিস করায়ত্ত করতে পারে। কিন্তু তা আমাদের আকিদা হরণ করতে পারবে না। আমাদের ডাক হচ্ছে দাওয়াত ও দায়ীর রিসালাত। আমাদের অবস্থান 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ছায়াতলে। আর 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এই বিশ্বাস আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রমাগত কাজ করার প্রেরণা যোগায়।

"এই কথা সত্য যে—ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে একমাত্র ওই মুসলিম উম্মাহর মাধ্যমে, যারা দীনের প্রতি সচেতন, যারা করে শরিয়তের শাসন এবং এই দীনপ্রচারে যারা সংগ্রাম করে।"

এখন করবটা কী?

সংগঠনের নারী সদস্যরা অতঃপর একের পর এক আমার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল যে, আমরা কী করবো?

১৯৬৪ সনে 'নাসেরি সরকারের' চোখের সামনে মুসলিম নারীদের অবস্থান ছিল এমনই বেপরোয়া। অথচ সময় তখন এমন যে, অজস্র লোক নীরবতা পালন করছিল। কেউ তো তাগুতের কাজের স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল; বরং তাদের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে ফতোয়া পর্যন্ত জারি করছিল। তাগুতকে তারা এমন রং লাগাচ্ছিল যা তাকে ইলাহর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আকিদা নষ্ট করে এবং মুসলিমদের ধোঁকা দিয়ে এমন নীরবতা পালন বা গা বাঁচানো ইসলামের ইতিহাসে একদিনও ছিল না।

আমরা এমন কিছু ইসলামি পত্রিকা দেখেছি, যারা তাগুতকে সন্তুষ্ট করতে প্রতিযোগিতা করছে। এমনকি আজহারের পত্রিকা, আমাদের কাছে যা মহার্ঘ; সেটাও। পত্রিকার কতক স্থানে নির্লিপ্তভাবে বাতিল ও বাতিলপন্থিদের সন্তুষ্টকারী মুনাফিকদের লেখা স্থান পেত।

ফতোয়াগুলো ক্রমাগত মুজাহিদদেরকে—যারা বাতিলকে ছুড়ে ফেলে হকের উপর অবিচল ছিলেন—আঘাত করে আসছিল। বাতিলকে প্রশ্রয় দেওয়াকে তারা

'রুখসত' নাম দিয়েছিল। মুজাহিদদের—যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে আঁকড়ে ধরার (তার সঙ্গে স্রেফ সম্পৃক্ত থাকা নয়) নেয়ামত দান করেছিলেন—জখম করে যাচ্ছিল। আঁকড়ে ধরাই হচ্ছে ইসলাম। আঁকড়ে না ধরে কেবল ইসলামের 'সঙ্গে থাকা' ভিন্ন জিনিস। মুসলিম নারী সঙ্ঘ তাদের কথিত এই রুখসত গ্রহণ করতে, অথবা কেবল ইসলামের নাম ধারণ করে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা এমন মুহূর্তে হকের ঝান্ডা উঁচিয়ে ধরল এবং সত্য কথা বলল, যখন অধিকাংশ মানুষই পদ ও দুনিয়া হারাবার ভয়ে হক ও সত্য থেকে সরে এসেছিল। কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি এরা, যেমনটা অধিকাংশ মানুষ করেছিল। বরং তারা, সেই ভয়াল ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে; স্বীয় মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে যে, এই সংগঠন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়—যদিও রুষ্ট হোক না কেন সারা দুনিয়া।

মুসলিম নারী সঙ্ঘ আমাকে না-দেখে অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে তারা আমার বাড়িতে একের পর এক এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মুসলিম নারী সঙ্ঘ ছিল আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব। তা প্রতিষ্ঠার দিনই আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে, যতদিন বাঁচব, আল্লাহর জন্যই বাঁচব। আমার বাড়িতে আসা মুসলিম নারী সঙ্ঘের অসংখ্য কর্মীও নতুন করে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করে নিচ্ছিল যে, তারাও যতদিন বাঁচবে হকের সাথে এবং তা প্রচারের স্বার্থে বাঁচবে। আমার কথায় তারা সায় দিল যে, তাদের বাড়িতে বিভিন্ন সভা হবে। সেখানে সংগঠনের নারী বক্তারা গিয়ে সাধারণ নারীদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষা দান করবে।

কিন্তু তাগুতি সরকার 'দায়ী ইলাল্লাহদের' প্রত্যেক স্থানের সভায় নজরদারিতে রাখত। তারা ওই সকল নারীকে—যাদের বাড়িতে ওয়াজ-নসিহত হতো—নোটিশ পাঠিয়ে হুমকি দিত। তাদের বাড়িতে যেন সভাটভা আর না হয়, এমন হুঁশিয়ারি দিত।

এরপরে সকল কাজকর্ম ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

দেনদরবার অতঃপর প্রবঞ্চনা

নাসেরি গোয়েন্দাবিভাগ বার বার আমার সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। নারী সঙ্ঘ পুনরায় শুরু করার জন্য তারা আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছিল। এই প্রস্তাবগুলো ছিল দীন বেঁচে দুনিয়া কেনার মতো।

উদাহরণস্বরূপ তারা আমাকে প্রতি মাসে ৩০০ জুনাইয়ের বিনিময়ে "আস-সাইয়েদাত মুসলিমাত" পত্রিকাটি, আমাকে প্রধানসম্পাদক করে; পুনরায় প্রকাশ করার প্রস্তাব দেয়। তবে পত্রিকায় কী লেখা হবে না হবে, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা থাকতে পারবে না। আমার জবাব ছিল: আবদুন নাসেরের সমাজতন্ত্র প্রচার করার জন্য গোয়েন্দাবিভাগ থেকে মুসলিম নারীদের পত্রিকা প্রকাশ করা অলীক চিন্তা। কেননা আমাকেই তখন কার্যত সকল দায়ভার নিতে হবে।

বাৎসরিক বিশ হাজার জুনাইয়ের বিনিময়ে সাধারণ মারকাজটা চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছিল তারা। তবে শর্ত হলো, তা হবে সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের একটা সংগঠন। আমার উত্তর ছিল: ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। যারা ইসলামের নামে ধান্দা করে, তারা ইসলামের খেদমত করতে পারে না।

এমন উত্তর তাদের উত্তেজিত করত। কিন্তু তবু তারা, ক্রমাগতভাবে, আমাকে ফুসলাবার চেষ্টা করত। তাদের এহেন ব্যর্থ চেষ্টা ও পদ্ধতি দেখে বেশ অবাক লাগত আমার। অবশ্য পরে আবিষ্কার করি এবং জানতে পারি যে, এরা কেন আমাকে ফাঁদে ফেলতে এতোটা মরিয়া!

বাদুড়ের দল

এক সন্ধ্যার কথা।

বাড়িতেই ছিলাম। তিনজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা মেহমানখানায় বসার পর আমি তাদের কাছে গেলাম। তাদের পরনে আরবি কোর্তা। সালাম দিলাম। তারা নিজেদের সিরিয়া-অধিবাসী বলে জানাল। সৌদি থেকে দশ দিনের এক ঝটিকা সফরে কায়রো এসেছে। তারা আরও জানাল যে, সৌদিতে উসতাদ সায়িদ রমাদান, শায়েখ মুসতফা আলিম, কামেল আশ-শরিফ, মুহাম্মদ আল-আশমায়ি এবং ফাতহি খুলির সঙ্গে দেখা করেছে তারা (এরা হলেন ওই সকল লোক, যারা তাগুতের জুলুম থেকে পালিয়েছেন)। মিশরের ইখওয়ানদের সালাম জানিয়েছেন তারা। তারা আশা করেন, মিশরবাসী তাদের উপর এবং তাদের সংগঠনের উপর আস্থা রাখবে। তারা আমাদেরকে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবার আদেশ করেছেন। আমরা আদেশ পালনের জন্য এবং সংগঠনের স্বার্থে মিশরে থেকে যাবার জন্য প্রস্তুত।

অতঃপর তারা ইখওয়ান ও আবদুন নাসেরকে নিয়ে আলাপ শুরু করল। কীভাবে সে (আবদুন নাসের) ইখওয়ানুল মুসলিমদের নিপীড়ন করে। তারপরে তারা ১৯৫৪ সনের ঘটনা নিয়ে এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নিষিদ্ধকরণ ও আবদুল কাদের আওদাহ এবং তার সঙ্গীদের শাহাদাত নিয়ে আলোচনা করল। তারা যে অভ্যুত্থান ঘটাতে এবং আবদুন নাসেরকে হত্যা করতে প্রস্তুত, তা নিয়েও কথা বলল। আর এটা নাকি কামেল আশ-শরিফ, আল-আশমায়ি, রমাদান, খুলি ও আলিমেরও মত।

আমি যখন তাদের কথা কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম, তারা তখন আমার মতামত জানতে চাইল। আমি বললাম, নতুন কিছু কথা শুনছি আমি। এবং এমন কিছু 'বিশেষ কথা' শুনছি, যার কিছুই আমি জানি না।

তারা বলল, বোন জায়নাব! আপনাকে আরেকবার কথাগুলো বলছি। যাতে এই বিষয়ে ইখওয়ানের মুরশিদ ও দলের মতামত জানতে পারি। এবং...।

সংক্ষেপে আমি তাদেরকে বললাম, প্রথমত আমি জানি না ইখওয়ানে দল বলতে কিছু আছে কি না। আমি জানি, একটা সংগঠন হিসেবেই ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমনটা সরকারও বলে থাকে।

দ্বিতীয়ত: এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমি মুরশিদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক হচ্ছে নির্মল ভ্রাতৃত্ব ও পারিবারিক মহব্বত। তৃতীয়ত: আবদুন নাসেরকে হত্যা করা মুসলমানদের কাছে অনভিপ্রেত—যেমনটা আমার মনে হয়। আপনাদেরকে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের ইসলামি শিক্ষায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিচ্ছি।

তারা দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল। এবার তারা বসল। তাদের একজন বলল, মনে হচ্ছে বোন জায়নাব অসন্তুষ্ট। আবদুন নাসের ছাড়া মুসলিম দেশকে আর কে ধ্বংস করেছে?

আমি বললাম, আবদুন নাসেরকে হত্যা করা ইখওয়ানুল মুসলিমের মিশন নয়। আমি তাদেরকে তাদের নাম দিতে বললাম। নাম দিতে গিয়ে তাদের ইতস্তেতের শেষ নেই—অথচ নাম তো তাদের মুখে থাকার কথা। তাদের নামগুলো ছিল– আবদুশ শাফি, আবদুল হক, আবদুল জলিল ঈসা ও আবদুর রহমান খলিল। যুগপৎ তিনটি নামেই 'আবদুন' শব্দ দেখে আমার হাসি পেল। তাদের মধ্যে একজনই তিনজনের নাম বলল কেবল।

আমি তাদের বললাম, আবদুন নাসেরের গোয়েন্দা-বিভাগের তোমাদের পাকড়াও করার আগেই স্বদেশে ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য উত্তম—যদি না তোমরা তাদেরকে জান এবং তাদের সঙ্গে তোমাদের আসলেই যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে। তাহলে আমি এমনটাই বিশ্বাস করি।

তাদের একজন বলল, ম্যাডাম, যেকোনো সময়ই অভিযোগ করার অধিকার আছে আপনার। অচিরেই আপনি আমাদেরকে আরেকবার দেখবেন এবং জানতে পারবেন যে, আমরা কারা।

এই বলেই তারা চলে গেল।

ভাই আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল আমাকে দেখতে এলে তাকে সিরিয়ান দাবিদার সাক্ষাতকারীদের কথা জানালাম।

সবাই যেন আহমদ রাসেখ

প্রথম সাক্ষাতের দু'সপ্তাহও কাটেনি।

হঠাৎই একদিন আহমদ রাসেখ নামক এক লোক দেখা করতে এল। নিজেকে সে গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলে পরিচয় দিল। আমার ও সিরিয়ান সাক্ষাতকারীদের

মাঝে কী হয়েছে, তা জানতে চাইল সে। আমি তাকে স্পষ্ট করে বললাম, খবর নিয়ে জেনেছি তারাও টিকটিকি, সিরিয়ান ইখওয়ানি নয়। তারা গোয়েন্দা বিভাগেরই লোক। তারাই তাদেরকে পাঠিয়েছে। আমি এ-ও বললাম যে, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাসুলভ বোকামি ধরনের কাজকারবার। তারা যা ইচ্ছা তা-ই করেছে। পত্রিকা ও সাধারণ মারকাজ জব্দ করেছে। এখন তারা আর কী চায়?

তার যে প্রশ্ন আশ্চর্য ছিল তা হলো; সে জামালুফ ও জামালিফা সম্পর্কে আমার মত জানতে চাইল। আমি তাকে বললাম, এরা সব নাস্তিক। বাতিল ও বাতিলপন্থিদের সঙ্গে থাকাকে এরা গৌরবের মনে করে।

সে প্রসঙ্গ পালটে বলল, ম্যাডাম, আমরা সকলেই তো মুসলিম।

আমি বললাম, মুসলিম হচ্ছে অন্য জিনিস।

সে বলল, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সমঝোতা করতেন তবে আগামীকালই সমাজকল্যাণমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়ে যেতেন।

বাঁকা হাসি দিয়ে বললাম, মুসলমানদেরকে 'পদ-লোভ' ভ্রষ্ট করতে পারে না। এবং তারা নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে হাতও মেলাবে না। যেদিন ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন মুসলিম নারীদের মারকাজ তারাই অবমুক্ত করে দেবে। আপনারা আমার কাছে চানটা কী?

সে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে সমঝোতা চাই।

আমি বললাম, এটা অসম্ভব। এক দল লোক কুফরের দাওয়াত দিচ্ছে, ভ্রষ্টতার ঝান্ডা তুলে ধরছে; আরেক দল মানুষ আল্লাহর তাওহিদের ও তার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি আহ্বান করছে। তারা কীভাবে এক হতে পারে?

পরপরই আমি বললাম, আপনারা তাওবা করুন আল্লাহর কাছে। ইসতেগফার করুন। ফিরে আসুন তার কাছে। আর আমি এই সাক্ষাত সমাপ্ত করতে চাই।

তাকে দেওয়া কফিতে শেষচুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা আপনার সাথে সমঝোতা চাই। যেদিন আপনার সাথে সমঝোতা হবে, সেদিন আপনিই সেই ক্ষমতা পাবেন যার মাধ্যমে মুসলিম নারী সঙ্ঘ অবমুক্ত করার এবং পত্রিকা চালু করার নোটিশ জারি করতে পারবেন।

আমি তাকে বললাম, শুকরিয়া। ইসলাম ওই সব সঙ্ঘ-সংস্থা থেকে অমুখাপেক্ষী, যা ইসলামের শত্রুদের দালালি করতে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আমাদের রব আপনাদের হেদায়েত দান করুন এবং কবুল করুন আপনাদের তাওবা।

এই সাক্ষাতের দু'দিন পরের কথা।

আমার বাড়ির সামনে একটা সরকারি গাড়ি এসে দাঁড়াল। তা থেকে একটা যুবক নামল। তার পরনে উর্দি রঙয়ের একটা পোশাক। আমি তখন বাড়ির বারান্দায় বসা। সে ঢুকে বলল, আস-সালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আমি সালামের

জবাব দিলাম। তাকে ভেতরে আসতে বললাম। মেহমানখানায় ঢুকেই সে নিজের পরিচয় দিল 'গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার আহমদ রাসেখ' বলে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মাপতে লাগলাম তাকে। তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ খুঁটিয়ে দেখলাম। কেননা একবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে আহমদ রাসেখ নামক এক লোকের সঙ্গে দেখা করার ডাক পড়েছিল আমার। সেখানে আমি গিয়েও ছিলাম। তার টেবিলের উপরে একটা ফলকে লেখা ছিল 'আহমদ রাসেখ'। অতঃপর দু'দিন আগেই আহমদ রাসেখ নামের এক লোক আমার সাক্ষাতে এসেছিল। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তিও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে নিজেকে আহমদ রাসেখ বলে পরিচয় দিচ্ছে।

একই নাম ভিন্ন ভিন্ন তিন ব্যক্তির। আমি তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কেননা গোয়েন্দাবিভাগের সবার নাম আহমদ রাসেখ হওয়া বিবেকবিরুদ্ধ। সে আমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করল, মিসেস জায়নাব! কী দেখে অবাক হচ্ছেন? আমার সাক্ষাতের কারণে?

এই বিষয়টাও আমাকে অবাক করেছে। উপহাস করে উত্তরে বললাম, না... এই বাড়ি সর্বদাই তার মেহমানকে সসম্মানে স্বাগত জানায়—তারা সময়ে আসুক কিংবা অসময়ে। কিন্তু আমি আপনাকে এমন একটা গল্প শোনাব, যা আমি আহরাম পত্রিকায় পড়েছি। গল্পটা হলো ইংল্যান্ডের রাজার আমন্ত্রণে হল্যান্ডের রাজা ও রানি এলেন। প্রায় একশ' বছর আগের কথা। ইংল্যান্ডের রাজা লক্ষ করলেন, তার অভ্যর্থনাকক্ষে থাকা একটা কুকুরের প্রতি হল্যান্ডের রানি বেশ আগ্রহী চোখে চেয়ে আছেন। হঠাৎ হল্যান্ডের রানি সেটার দিকে ছুটে গেলেন—যেন তার হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়ে গেছে। তিনি সেটাকে বুকে টেনে নিলেন। বেশ আগ্রহ ও স্নেহ নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন। তারপর সেটা তার স্বামীর কাছে দিলেন। তিনি কুকুরের চোখ ও মুখের দিকে ইশারা করে তার স্বামীকে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। রাজাও তখন অনুরূপভাবে চুমু খেতে লাগলেন।

এই দেখে ইংল্যান্ডের রাজা-রানি ভারি অবাক হলেন। বিশেষ করে যখন হল্যান্ডের রানি ফিরে এলেন। তিনি তার স্বামীর থেকে কুকুরটাকে নিলেন। তারা দু'জনই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি মুছছিলেন। প্রিয় সন্তানের মতো করে তিনি কুকুরটাকে আগলে রাখলেন নিজের বুকে।

যখন তাদেরকে খাবার টেবিলে ডাকা হলো, হল্যান্ডের রানি কুকুরটাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেটাকে খাওয়াতে লাগলেন।

ইংল্যান্ডের রানি বললেন, কুকুরটা তার প্রিন্সেসের।

রাজা তার মেহমানের কাছে কুকুরের সঙ্গে সম্পর্কের আসল বিষয়টা জানতে চাইলেন। তিনি মুখ কাচুমাচু করে আরও বললেন, কুকুরটা আমার রাজকুমারীর না হলে আপনাদের উপহার হিসেবে দিয়ে দিতাম।

হল্যান্ডের রানি, যিনি 'আত্মার স্থানান্তরে' বিশ্বাস করতেন; তখন বললেন, তার একটি ছেলে ছিল। মারা গেছে। ছেলের রুহ এই কুকুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। রানি তখন ইংল্যান্ডের রাজা-রানিকে বোঝাতে লাগলেন যে, কুকুরের চোখদুটো হুবহু তার ছেলের চোখের মতো।

ইংল্যান্ডের রাজা তার মেয়েকে, যে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে বসেই গল্পটা শুনছিল; কুকুরটা উপহার দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে রাজি করালেন। রাজকুমারী কুকুরটাকে হল্যান্ডের রানিকে উপহার দিয়ে দিলেন।

তারপর আমি তাকে বললাম, শুনুন মিস্টার রাসেখ। যারা আত্মার স্থানান্তরের বিশ্বাস লালন করে, তারা মৃত ব্যক্তি এবং তার আত্মা প্রবিষ্ট হওয়া ব্যক্তির মাঝে কিছু সাদৃশ্যের দাবি করে। কিন্তু গোয়েন্দাবিভাগের তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, যারা নিজেকে আহমদ রাসেখ বলে দাবি করে। অথচ তাদের মাঝে গঠনে-গড়নে ও বর্ণে পুরোই অমিল। কোনো সাদৃশ্যই পাওয়া যাচ্ছে না তাদের মাঝে। তোমাদের সরকারপ্রধান কি 'আত্মার স্থানান্তরের' নতুন মতবাদ চালু করবেন বলে ঠিক করেছেন? এবং তোমাদের তা গ্রহণ করার হুকুম করেছেন?

এই কথা শুনেই তার মুখ প্যাঁচার মতো হয়ে গেল। সে বলল, ম্যাডাম, আমরা ভালো মানুষ। আমরা আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই। আসলেই আমি আহমদ রাসেখ।

আমি বললাম, এই বিষয়টার তেমন গুরুত্ব নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী চান?

সে বলল, সরকার আন্তরিকভাবেই আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। আমরা জানি, ইখওয়ানুল মুসলিমিন আপনাকে ঠকিয়েছে। তাদের বাহ্যিক বিষয় দেখিয়েই ভুলিয়েছে আপনাকে। মুসলিম নারী সঙ্ঘের সঙ্গে যা ঘটেছে এবং তার প্রধান কার্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া; এ সবই ইখওয়ানের কারণে। এরা হচ্ছে দাঙ্গাবাজ ধরনের লোক। আমরা চাই, আপনি আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। আমাদের চাওয়াটা খুবই সাধারণ। তা হলো, ইখওয়ানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত লোকদের চিহ্নিত করা। মাননীয় প্রেসিডেন্ট আপনার এই উপকার ভুলবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই আপনি এমন ফল পাবেন, যা আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে সাহায্য করবে। সারা জীবনই আপনি নির্ঝঞ্ঝাট কাটিয়েছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনদের দাঙ্গার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কারণে সরকারের সঙ্গে আপনার যা হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট।

সে আরও দাবি করতে লাগল যে, উসতাদ ইমাম হুদাইবি ও ইমাম সাইয়েদ কুতুব, তারা উভয়েই সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন;

কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন। কেননা তিনি তাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না।

সে আরও যোগ করে বলল, আপনি যদি জানতেন, ইখওয়ানিরা আপনার সম্পর্কে কী বলে; তবে আপনি আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন।

এই কথা শুনতেই হাসি পেল আমার। তারপর বললাম, আমি আপনার সঙ্গে গোয়েন্দা-বিভাগের একজন কর্মী হিসেবেই কথা বলব। এই মুহূর্তে নাম-ধাম অতোটা গুরুত্ব রাখছে না।

প্রথমত: যেসকল মুসলমান ইসলামের কেবল বাহ্যিক বিষয়টা জানে, তারা পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে আপনারা ইসলাম থেকে দূরে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে। তো আপনারা কি বাতিলকে সমর্থন করে আমার সঙ্গে হকের বোঝাপড়া করতে চাচ্ছেন? পূর্ব-পশ্চিম যেখান থেকে পারছেন আপনারা আকিদা ধার করে আনছেন, নাস্তিক্যবাদী ঝান্ডা ওড়াচ্ছেন, কখনও আপনারা পদলেহন করছেন পুঁজিবাদের; নাস্তিক্যবাদী ও পুঁজিবাদীর পঙ্কে আপনার গড়াগড়ি খাচ্ছেন। এই পঙ্কিলতা থেকেই নিজেদের শরিয়ত ও বিধান গ্রহণ করছেন আপনারা। আপনার সাথে আরও খোলাখুলি কিছু বলবার প্রয়োজন দেখছি না। আমার কথা স্পষ্ট— কোনো ব্যাখ্যা দরকার নেই। আপনারা যা চাচ্ছেন, ইসলাম তার চেয়ে ভিন্ন কিছু।

সে বলল, ম্যাডাম, আমি জুমার নামাজ পড়ি।

আমি বললাম, বাকি ফরজ?

আমি কেবল, সে বলতে লাগল; জুমার নামাজ পড়তেই অভ্যস্ত। কেননা আমার বাবাও এমন করতেন। তিনি জুমার দিন আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতেন।

আমি বললাম, আপনি কি বাবাকে জিজ্ঞেস করেননি তিনি কেন শুধু জুমার নামাজ পড়েন?

সে বলল, ম্যাডাম, যতক্ষণ আমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব, ততক্ষণ আমাদের অন্তর মুসলিম।

আমি বললাম, ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা তোমাদের কাজের মধ্যে নেই। অচিরেই তা আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে— তোমাদের পক্ষে নয়।

সে বলল, আন-নাসু আলা দীনি মুলুকিহিম। মানে মানুষ তো তার শাসকের ধর্মমতেই চলে।

আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ, অচিরেই তোমাদের হাশরও হবে তোমাদের শাসকদের ধর্মের উপরই।

সে বলল, আসুন, আমরা এক হয়ে যাই।

আমি বললাম, গোটা ইতিহাসে নবীগণের রিসালাত কখনোই বাতিল ও তার দোসরদের সঙ্গে আঁতাত করেনি। বরং উলটো তাদেরকেই আহ্বান করেছে আল্লাহ সুবহানাহুর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে।

অতঃপর সে চলে গেল। যাওয়ার সময় রাগে গজগজ করতে করতে বলল, ঠিক আছে। আমি আর কিছুতেই দ্বিতীয়বার আসছি না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে, এই নিন আমার টেলিফোন নম্বর।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। এর প্রয়োজন নেই আমার।

১৯৬৫ সনের জুলাই মাসের শেষদিকে আমি জানতে পারলাম, ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠনের লোকদের ধরার তোড়জোড় চলছে।

এই দলের সঙ্গে আমার ছিল জোরালো পুরাতন সম্পর্ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি বাইয়াত এবং তারপর...

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হালের নয়—যেমনটা কিছু বাচালের ধারণা। এই সম্পর্কের ইতিহাস ১৩৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৭ সন থেকে। ১৩৫৮ হিজরিতে, মুসলিম নারী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় মাসছয়েক পর; প্রথম আমার দেখা হয় ইমাম হাসানুল বান্নার[৫] সঙ্গে— ইখওয়ানের ভবনে মুসলিম নারীদের সামনে দেওয়া আমার ভাষণের পরেই। ভবনটি তখন আতাবায় ছিল।

---

[৫] ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখ মিশরের মাহমুদিয়া এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন শহীদ হাসানুল বান্না। তার বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম। কোরআনের হাফেজ। শৈশবেই বাবার কাছে তার পড়াশোনার হাতেখড়ি। পরিবারের তত্ত্বাবধানেই তিনি কোরআনুল কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেন।

ইসমাইলিয়া শহরে তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি জ্ঞানের ময়দানে জায়গা করে নেন। সেই বয়সেই তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। অতঃপর আল-আজহার ইউনিভার্সিটির শাখা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুমে ভর্তি হন। সেখানে বেশ সম্মানের সাথে পড়াশোনা করেন। এবং ১৯২৭ সনে সেখান থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করেন। সে বছরই তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসমাইলিয়া শহরে আমিরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

শিক্ষকতার এক বছরের মাথায় ১৯২৮ সনে তিনি তার কিছু বন্ধুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ইখওয়ানুল মুসলিমিন। শুরুর দিকে এই সংগঠন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকে। স্বভাবতই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এবং নীতিনির্ধারকরা তার এই কার্যক্রম ভালো চোখে দেখে না। ফলে ১৯৩২ সনে তাকে বদলি করে দেওয়া হয় কায়রোতে। কায়রোতে এসে তিনি তার কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করবার সুযোগ পেয়ে যান।

নানান চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে মিশরের ইতিহাস চলছিল। ক্ষমতার উত্থান-পতনের ধারা চলছিল অবিরত। সেই সময়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সনে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বাহিনীর সহযোগিতার জন্য হাসানুল বান্না ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রেরণ করেন। সেখানে ইখওয়ানের লোকেরা বেশ বীরত্বের সাথে লড়াই করে।

পশ্চিমা বিশ্ব এতে ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৪৮ সনে মিশরের পশ্চিমা পুতুল সরকারের মাধ্যমে ৮ ডিসেম্বর ইখওয়ান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এবং দেশজুড়ে চলতে থাকে ইখওয়ানিদের গণগ্রেফতার।

সরকার হাসানুল বান্নাকে বেশ ক'বার গ্রেফতারও করে। কিন্তু প্রবল সমালোচনার মুখে এবং কোনোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। সরকার কোনো গত্যন্তর না পেয়ে তাকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা নেয়।

১৯৪৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি। কায়রোতে এক সেমিনারে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য প্রদান শেষে তিনি গাড়িতে চড়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। সন্ধ্যাবেলা প্রকাশ্যে গুলি করা হয়। তাকে দ্রুত নেওয়া হয় হাসপাতালে। তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এবং তিনি ইনতেকাল করেন। রহিমাহুল্লাহ।

ইমাম ও মুরশিদ সেই সময়ে 'আখওয়াতুল মুসলিমাত' (ইখওয়ানের নারী বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করার বন্দোবস্ত করছিলেন। মুসলমানদের এক কাতারে আসার এবং তাদের ঐক্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথাবার্তার পর তিনি আমাকে আখওয়াতুল মুসলিমাহর প্রধান হবার আমন্ত্রণ জানান। বিষয়টি ছিল সদ্য জন্ম নেওয়া 'মুসলিম নারী সঙ্ঘকে' (যাকে নিয়ে আমি গর্ব করি) ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তার শাখা বানিয়ে দেওয়া।

এ নিয়ে আমি নারী সঙ্ঘের সাধারণ পর্ষদে কথা তুলেছিলাম; কিন্তু তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যদিও উভয় সংগঠনের মাঝে মজবুত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকার বিষয়ে সকলেই বেশ উৎসাহ যুগিয়েছিল।

আমরা উভয়ে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকার পরও তার সাথে আমার বহুবার দেখা হয়েছিল। 'আখওয়াতুল মুসলিমাহ' প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু তা আমাদের দীনি সম্পর্কে সামান্য ফাটল সৃষ্টি করেনি। নারী সঙ্ঘের ভবনে আমাদের শেষসাক্ষাতে আমি তার (হাসানুল বান্নার) রাগ কিছুটা প্রশমিত করতেই প্রতিজ্ঞা করলাম নারী সঙ্ঘ ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রাসাদেরই একটি ইট হবে। তবে মুসলিম নারী সঙ্ঘ স্বনামে ও স্বীয় ধারায় কাজ করবে। এর মাধ্যমে দাওয়াতের বিশাল উপকারও পাওয়া যাবে।

তা সত্ত্বেও দুই সংগঠনকে একীভূত করার বদলে এমন প্রস্তাবও তার মনঃপূত হয়নি।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে যায়। ১৯৪৮ সনের ঘটনাগুলো সংঘটিত হলো। ইখওয়ান নিষিদ্ধের ফরমান জারি হলো। জব্দ করা হলো তাদের সম্পদ। তাদের শাখা অফিসগুলো সিলগালা করা হলো। হাজারও লোককে গ্রেফতার করা হলো।

এই সময়ে আখওয়াতুল মুসলিমাহর নারীরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাকে শুকরিয়া জানাতে হয়। তাদের একজনের নাম হচ্ছে তাহিয়্যাহ আল-জুবাইলি— আমার ভাইয়ের স্ত্রী, চাচাত বোন। তার থেকেই বিস্তারিত শুনেছি। সব শুনে, এই প্রথম উসতাদ বান্নার সকল কথার প্রতি এবং বার বার উভয় সংগঠনকে সম্পূর্ণ একীভূত করার বিষয়ে তার চাপাচাপির প্রতি আমার মন দুলে উঠল।

ইখওয়ান নিষিদ্ধ করার পরের দিনের কথা। আমি মুসলিম নারী সঙ্ঘের ভবনে আমার দফতরে ছিলাম। এই দফতরেই ইমাম ও মুরশিদের সঙ্গে আমার শেষসাক্ষাত হয়। আমি টেবিলের সামনে বসে, বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে; হু হু করে কাঁদছিলাম। বার বার মনে হচ্ছিল হাসানুল বান্নাই সঠিক ছিলেন। তিনিই সেই ইমাম, যিনি জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন সকল মুসলমান থেকে নিজেদের দায়িত্ব পুনরুদ্ধারে, নিজেদের প্রকৃত রূপে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে। সেই